KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7·5"x6"
Vol. & Number : ৫/1 5/2 5/3 5/4 5/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ আষাঢ় ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ ভাদ্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বাঙ্গালীর শিক্ষা।

—:*:—

(১)

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সরকারী কমিশন বসিয়াছে। সাগরপার হইতে গুণী জ্ঞানী সভ্যেরা আসিয়া মন্ত্রণা সভায় বসিয়াছেন। লর্ডকর্জ্জনের তৈরী কাঠামের উপর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী, অনেকটা যাঁর নিজের হাতে গড়া, সাগরের এ পারের লোক হইলেও ঐ সভায় তাঁহাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবং দুই কোটী বাঙ্গালী মুসলমানের স্বার্থের হিসাবে কোন ভূলচুক না হয়, তাহার দৃষ্টির জন্য আলিগড় হইতে উচ্চ গণিতজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিত সভাসদ হইয়া আসিয়াছেন। আশা ও আশঙ্কায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে বাঙ্গালীর শিক্ষার দু' একটা মোটা সমস্যার আলোচনা করা যাক্।

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত সভ্য সমাজেই শিক্ষা ব্যাপারটী লইয়া নানা রকম সমস্যা উঠিয়াছে। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার সুব্যবস্থাই বা কি এ দুই বিষয়েই যথেষ্ট মত ভেদ আছে। এবং দুইটী রাশিই যদি অব্যবস্থিত হয়, তবে তাহাদের সমবায়ে কেমন জটিল বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা গণিতের সাহায্য ব্যতীতও সহজেই বোঝা যায়। আর এ বিষয়ে মতভেদও অতি

স্বাভাবিক; বরং মতের প্রকার ভেদ কিছু কম হইলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। একে তো শিক্ষা জিনিসটা, তা তার প্রণালী সে রকমই হোক, অনেকটাই অজানা মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ফসলের আশায় বসিয়া থাকার মত। কোন জমিতে যে কেমন বীজে কোন ফল ফলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। যে পথে চলিয়া বৈদ্য চিকিৎসক হয় বসিয়া নিন্দুক লোকে রটায়, সেই ঠেকিয়া শেখার পথটা এখানে অনেকটা সঙ্কীর্ণ, কেননা এক জমিতে দুইবার বীজ বুনিবার উপায় নাই। এবং শিক্ষার তত্ত্ব ও শিষ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর পুঁথি ও পাণ্ডিত্য থাকা স্বত্বেও, যে-মন লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হয়, কোনও বৈজ্ঞানিক আচার্য্যের যন্ত্রের মধ্যে তাহা ধরা দেয় না। সমস্ত মনস্তত্ত্বই সাধারণ মনের তত্ত্ব, অর্থাৎ যে মন কল্পনায় আছে কিন্তু বস্তুগত্যা নাই। আর শিক্ষকের কারবার হইল বিশেষ মনকে লইয়া, যাহা এই নিয়মের জগতে প্রায় খাপছাড়া অনিয়ম, যাহার বিকাশ ও বিকারের রীতি দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় গুহাস্থিত ও দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য দেখা যায় অতি-অবৈজ্ঞানিক সেকেলে ধরণের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়াও মানুষের মন বিকশিত হইয়া ওঠে, আবার অত্যন্ত টাট্‌কা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ইহার 'সনাতন জড়তায়' ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কোনও প্রণালীরিই ফলটা প্রবর্ত্তকের আশানুযায়ী বা নিন্দুকের ভবিষ্যৎ বাণীর অনুরূপ পুরাপুরি রকমে ফলে না। সুতরাং শিক্ষার প্রণালী লইয়া তর্কে কোনও পক্ষেরই একবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা ফলের কষ্টিপাথরে প্রণালীকে কষিয়া এমন কিছু দেখান যায় না, যাহাতে তার্কিককে নিরুত্তর করিতে পারা যায়।

(২)

তারপর শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে একটা নিত্য চিরস্থির অংশ হয়তো বা আছে। কিন্তু চিরকালই নানা নৈমিত্তিক লক্ষ্য, কখনও জীবন যুদ্ধের টাট্‌কা রক্তে রঙ্গিন হইয়া, কখনও বা কেবল অস্থিরতার চাঞ্চল্যেই মানুষের দৃষ্টিকে তাদের দিকেই টানিয়া রাখিয়াছে। কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র, কখনও ধন, কখনও শক্তি, কখনও বাক-পটুতা, কখনও বা কেবল জীবিকা, শিক্ষার একমাত্র অন্তত প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মানুষে প্রচার করিয়াছে। এবং ইহাদের কোনটিই মানুষের কাছে তাচ্ছিল্যের সামগ্রী না হওয়াতে সকলের দাবীই মানুষ উপস্থিতমত মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তর্কেও কোন পক্ষেরই একবারে অজয় পত্র লিখিয়া দিবার মত, পরাজিত হইবার আশঙ্কা নাই।

কিন্তু এ সকল তত্ত্ব ও তর্ক সব দেশের ও সব কালের সাধারণ সমস্যা, বাঙ্গলা-মাসিকের পণ্ডিতদিগের ভাষায় 'বিশ্ব সমস্যা'। পণ্ডিতগণের উপরেই ইহাদের নিরাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার দুই একটা বিশেষ সমস্যার আলোচনা সুরু করা যাউক্।

(৩)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজে হালে যে শিক্ষা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সকল পক্ষই বলিতেছেন এ শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা নয়; যেমনটী হওয়া উচিত এ শিক্ষা তেমন শিক্ষা নয়। কিন্তু অসন্তোষ সাধারণ হইলেও অসন্তুষ্টির মূল এক

নয়। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী লইয়া নানা মতভেদের শাখা, কখনও পাতা কখনও কাঁটা মেলিতেছে।

এ দেশের শিক্ষা লইয়া যাহারা চিন্তা করেন এবং চিন্তা না করিলেও কথা বলেন তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল পক্ষ হইলেন দেশশাসক আমলাতন্ত্রের সভ্যেরা, এবং তাঁহাদেরি জ্ঞাতি কুটুম্ব ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের দরবারে, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায়, নিজেদের ভোজের মজলিসে আমাদের শিক্ষার গলদ যে কোথায় তা বেশ স্পষ্ট কথাতেই ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন এই যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা সেক্সপীয়র মিল্টন পড়িতেছে, বার্ক মিল মুখস্থ করিতেছে, লিবিগ ফ্যারাডের তত্ত্ব ঘাঁটিতেছে, এসব একবারে নিরর্থক ও নিষ্ফল। এসব ছেলেরা ত স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া ওকালতি ডাক্তারির বাজারে ভিড় করিবে, না হয় মুন্সেফী ডিপুটীগিরির উমেদারীতে ফিরিবে, আর অধিকাংশই সরকারী ও সওদাগরী আফিসের কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবে। ইহাদের জন্য এ শিক্ষা কেন? ধান কলাই যার লক্ষ্য সে কেন গোলাপের কেয়ারীতে পরিশ্রম করে? অর্থাৎ দেশব্যাপী ব্যবহার ও বাণিজ্যের যে কল চলিতেছে, তার চাকা গুলিকে' স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় চালাইয়া লইবার মত মজুর, মিস্ত্রী, বড় জোর ফোরম্যান মিকানিকের উপযোগী যে শিক্ষা, তাহাই হইল বাঙ্গালীর যথেষ্ট এবং যথার্থ শিক্ষা। ইহার জন্য 'স্যাম্‌সন্ য়্যাগ্‌নিষ্টেশের' সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অনুশীলন প্রয়োজন হয় না; বড় সাহেবের মনঃপূত চলতি ইংরেজিতে কাজের চিঠি মুসবিদা করিতে জানাটাই

বেশী দরকার। আর সেই পত্র রচনায় মিল্টনের ভাষা কোনও সাহায্য ত করেই না, বরং বিদেশীকে বিপথেই লইয়া যায়। সুতরাং আমাদের স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা যেমন অনুপযোগী তেমনি ফাল্‌তো। আর শিক্ষার এই বাহুল্যটা যদি কেবল নিষ্ফলই হইত তবুও সে এক রকম ছিল। কিন্তু ইহার কিছু ফলও ফলে, এবং আশঙ্কার কথা এই যে ফলটা সমস্তই কুফল। পশ্চিমের সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শণ ইতিহাস মুখস্থ করিয়া পূব দেশের লোকদের মাথা ঠিক থাকে না। পশ্চিম যে পশ্চিম এবং পূব যে পূব এই সাধারণ জ্ঞানটাও লোপ হয়। এবং যে সকল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পশ্চিম দেশের জন্যই প্রচার করিয়াছেন এই অত্যন্ত পূব দেশেও এরা হাতে কলমে সে গুলির প্রয়োগ দেখিতে চায়। এই সকল তত্ত্ব কথায় 'মানুষ' শব্দের অর্থ যে পশ্চিম দেশীয় শ্বেত-বর্ণের মানুষ এ সহজ কথাটা ইহারা বুঝিতে পারে না। যতই কেন জিয়গ্রাফি মুখস্থ করুক না ল্যাটিচুড লঙ্গিচুডের জ্ঞানটা ইহাদের কিছুতেই পাকা হয় না। ফলে নিজেদের অবস্থায় ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি যে শাসকসম্প্রদায় এই দেড়শ বছর ধরিয়া নিশ্চল শান্তির মধ্যে পূর্ব্ব দেশের লোকদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইহাদিগকে সেই উন্নতির পথে অতি সন্তর্পণে, সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের উপরেও ইহারা ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের ভাব দেখায়; উন্নতির গতির মন্থরতায় অসহিষ্ণু হইয়া মনে করে ছাড়া পাইলে বুঝি আরও একটু দ্রুত চলিতে পারে। এবং শাসনের কলটা যে নিজেরা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া চালাইতেও বা পারে এমন কল্পনাও ইহাদের মনে আসিয়াছে। এমন কি কলটা এ রকম না

হইয়া অন্য রকম হইলেও একবারে অচল হয় না এমন কথাও ইহারা বলিতে সুরু করিয়াছে। এ সকলি যে বাহুল্য শিক্ষার বিস্তৃত ফল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

(৪)

দেশের লোক বলে, এবং বলিতে সাহস না করিলে মনে ভাবে, শিক্ষাটা যে কেবল বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়াই দিতে হইবে সেই বা কোন স্থিরসিদ্ধান্ত। বর্ত্তমানে আমরা ছোট কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। শিক্ষাটা সেই ঈপ্সিত ভবিষ্যতের অনুকুল করিয়াই আরম্ভ হোক না। আর জীবিকার জন্য যে টুকু দরকার শিক্ষার পরিমাণ যে, ঠিক সেই টুকুই হইবে এ ব্যবস্থা ত অপর কোন দেশে দেখা যায় না। আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজের দেশে যে শিক্ষা পাইয়া আসেন, প্রাচীন গ্রীস রোমের সাহিত্য ইতিহাসই ত তাহার প্রধান উপকরণ। এদেশে যে কাজে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইতেছে সে কাজে ঐ শিক্ষা কতটা সাহায্য করে এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। আফিসের বাহিরেও কেরাণী কেরাণীই থাকিবে এত বড় দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া ত সহজ নয়!

প্রজার সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীদের এ দেশের উপযোগী শিক্ষার আদর্শের এই প্রভেদ, ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার প্রথম সমস্যা; যাকে বলা যায় শিক্ষার রাজনৈতিক সমস্যা। রাজপুরুষেরা দেখেন আমাদের বর্ত্তমান, আমরা ভাবি আমাদের ভবিষ্যৎ। তাঁরা চান সেই শিক্ষা যেটা বর্ত্তমান শাসনরীতি ও অন্যান্য নীতির অনুকূল। আমরা

কামনা করি এমন শিক্ষা যেটা ভবিষ্যৎকেই আমাদের নিকটে আনে। তাঁদের দৃষ্টি এক দিকে, আমাদের চোখ অন্য দিকে।

(৫)

আমাদের রাজপুরুষেরা যে আমাদের ভবিষ্যৎটাকে একবারে অস্বীকার করেন এমন কথা বলি না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁদের অনেকে আমাদের যে একটা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, যেটা বর্ত্তমানের চেয়ে অন্য রকম, হয়ত মহত্তর এবং বৃহত্তর, এ কথা প্রকাশ্যেই বলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন সে ভবিষ্যৎ এতই সুদূর ভবিষ্যৎ যে তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও বুদ্ধিমান লোকই বর্ত্তমানের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যে ভবিষ্যৎ এখনও স্বপ্নলোকের কল্পনাতেই আছে, জাগ্রত লোকের বস্তু-জগতে তার স্থান নাই। অর্থাৎ যেটা পারমার্থিক ভাবে আছে, কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে নাই। সুতরাং তাকে কথায় স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাজে স্বীকার করা নির্বুদ্ধি ও অকেজো লোকের লক্ষণ।

শিক্ষার এই রাজনৈতিক সমস্যাটা অতি জটিল ও ব্যাপক। এবং এই ব্যাপক সমস্যা হইতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির ছোট, বড়, কঠিন, সুকঠিন নানা রকম সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং দিন দিন হইতেছে। ইহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের কথা বোঝেন না; আমরা তাঁদের কাজে আশঙ্কিত হইয়া উঠি। আমরা বলি আমাদের গরীব দেশ, শিক্ষাটা যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়সাধ্য করা হোক; তাঁরা ভাবেন সস্তা অর্থ যে খেলো ইহাদের সে জ্ঞান ত নাই। দেশে স্কুল কলেজ বাড়িতেছে, পড়ুয়া তার চেয়েও বাড়িতেছে;

আমরা উৎফুল্ল হইয়া ভাবি শিক্ষার বিস্তার হইতেছে; কর্ত্তৃপক্ষ শিহরিয়া বলেন এ সব ছেলে বাহির হইয়া করিবে কি, সরকারী ও সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি আর ত খালি নাই।

যা হোক এই রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার উপায় শিক্ষানীতির মধ্যে নাই। এ জটিলতার নিবৃত্তি শিক্ষাতত্ত্ববিদের এলাকার বাহিরে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত একসঙ্গে করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। কেননা এ সমস্যার মীমাংসা হইবে শিক্ষানীতি ক্ষেত্রের বাহিরে, রাজনীতির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর পুঁথি না বাড়াইয়া সমস্যান্তরে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

(৬)

আমাদের শিক্ষার দ্বিতীয় সমস্যা হইল অন্নসমস্যা। দেশের অনেকে প্রচলিত শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে, সে শিক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়া ছেলেরা যেকয়টা চাকরী ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়া বাহির হয় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য, এবং ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুপাতে সে সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং বর্ত্তমানেই তাহার মূর্ত্তিটা যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেশের শিক্ষা যদি শিক্ষিতের এই অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে না পারে তবে তাহা ব্যর্থ শিক্ষা, যাহার পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গলা দেশের এই অন্নাভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমস্যা যে দিন দিন উৎকট হইয়া উঠিতেছে সেদিকে চক্ষু বুজিয়া কোনও লাভ নাই। এবং ইহার একটা ব্যবস্থা না হইলে যে জাতিরও মঙ্গল নাই তাহাও নিশ্চিত সত্য। ইংরেজ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার,—যাঁর একটা অভ্যাস ছিল সকলের জানা অত্যন্ত সাধারণ তথ্য হইতে গভীর তত্ত্ব কথার নিষ্কাশনের চেষ্টা করা,—তাঁর একখানি সুপরিচিত গ্রন্থের একটী অধ্যায়, তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, জীবের কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন; সুতরাং যে বিধিব্যবস্থা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহার দাবী, যে সকল বিধিব্যবস্থা, তাহাকে আর সব কাজের উপযুক্ত করে, তাহাদের চেয়ে প্রবল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্নাভাব মোচনের ব্যবস্থা যে আর না করিলেই নয় এ কথা সমর্থনের জন্য জীববিদ্যার এই আদিতত্ত্বে যাইবার প্রয়োজন হয় না। আজ বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য যে কেমন করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতেছে, স্বাস্থ্যকে বিদায় দিতেছে, দেহ মনের সমস্ত স্ফূর্ত্তি ও আনন্দকে পিষিয়া মারিতেছে, মনুষ্যত্বকে পাহাড় প্রমাণ ভারের নীচে চাপা দিতেছে, তাহা দেখিলে স্বয়ং মোহ মুদ্গরের কবিও অনর্থের অর্থ যে কি তাহা, নিত্য না হোক অন্তত মাঝে মাঝে, ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতেন।

কিন্তু আমাদের অন্নসমস্যা এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন। অন্নসংগ্রহকে জাতির সমস্ত চেষ্টা ও প্রতিভার কেবল প্রথম নয় প্রধান লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যার একটা উত্তর খুঁজিবার প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু রোগনাশের উৎসাহে

রোগীর প্রাণান্ত ঠিক চিকিৎসা নয়, যদিও সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবল সাফল্যে চিকিৎসিতের মৃত্যুসংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। বাঙ্গালীর এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কেবল অন্নে জীব বাঁচে কিন্তু জাতি বাঁচে না।

(৭)

অন্ন সংস্থানের নিক্তিতে ওজন করিয়া স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকে ঝুঁটা সাব্যস্তের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা প্রকৃত কথা এই যে ছাত্রের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া এ শিক্ষার লক্ষ্যই নয় এবং হওয়া উচিত নয়। এ লক্ষ্য কি তাহা একবার 'সবুজপত্রে' আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির অধিকার নাই। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রকে শিক্ষিত করা। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত অন্নে সকলেরই সমান প্রয়োজন। সুতরাং সমাজেও রাষ্ট্রে শিক্ষিতেরও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা চাই। এই শিক্ষিত শ্রেণীই হইল সমাজের মধ্যমণি, সমাজ বৃক্ষের অমৃত ফল। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে জাতির বর্ত্তমান প্রাণ-হীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ন-সংগ্রহের পথ যথেষ্ট মুক্ত নাই। কেন নাই, সে আলোচনা নাই করিলাম। কিন্তু সমস্যা এ নয় যে, যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা শিষ্যের জীবিকা অর্জ্জনকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইতেছে না।

প্রচলিত শিক্ষার যে সমালোচনার কথা বলিতেছি তার প্রধান কথা এই যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছেলেরা এমন শিক্ষা পাইতেছে না যাহাতে চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতির রুদ্ধপ্রায় সঙ্কীর্ণ গলিতে আর

ভীড় না করিয়া, শিল্প বাণিজ্যের প্রশস্ত রাজপথে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সত্যের আড়ালে গোটা কয়েক বড় বড় মিথ্যা সব সময়েই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তাহাদের তাড়াইতে না পারিলে এই সত্যের প্রকৃত চেহারাটী প্রকাশ হইবে না!

(৮)

প্রথম, বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিল্প বাণিজ্যের যে শিক্ষা দিবে তাহা তার সাধারণ সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্ত্তে নয়; ঐ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের জন্যই বিশেষ শিক্ষা। যাঁরা মনে করেন প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা হাতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করিলেই দেশের দারিদ্র্য সমস্যার মীমাংসা হইবে, তাঁদের সরল বিশ্বাসে অবশ্য মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের শিল্প বাণিজ্য বিষয়টী কি, তাহার অস্পষ্ট ধারণাও তাঁদের আছে কি না তাহাতেও সন্দেহ না করিয়া উপায় থাকে না। যে সব জাতি দেশের শিল্প বাণিজ্যকে দেশের উচ্চ শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র চালান যায় ভাবিয়াছিল, আজ পৃথিবীর শিল্প বাণিজ্যের দৌড়ে তারা যে দিন দিন পিছাইয়াই পড়িতেছে তাহা ত আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেশের উচ্চ শিক্ষাকে সংকীর্ণ করিয়া শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলার কল্পনা, আহার বন্ধ করিয়া কেবল কুস্তিতে শরীর গড়ার চেষ্টার মতই ভয়ানক।

(৯)

আচার্য্য হেলম্‌হোল্‌ৎস একবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করে, সে সত্য ঘরকন্নার কাজে লাগিবে কিনা সে চিন্তা তার নয়। আজ জার্ম্মাণিতে কি সুর বাজিতেছে জানিনা। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের এই নিষ্কাম সাধনা বন্ধ হইলে ক্রুপের কারখানাও বেশী দিন খোলা থাকিবে না। আর যে শিল্প বাণিজ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না দেশের উচ্চ শিক্ষিতকেও তাহাতেই রত করান, এই পৃথিবী জোড়া প্রতিযোগিতার যুগে, সমাজ নীতির কথা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র ধন বিজ্ঞানের চোখও যে কত বড় অপব্যয়; তাহাতে যে অন্নসমস্যার সমাধান না হইয়া কেবল জটিলতার বৃদ্ধিই হয়, তাহা অল্প চিন্তাতেও বোঝা যায়। শোনা যায় অবস্থা বিশেষে বাঘও নাকি ধান খায়। কিন্তু সেটা ব্যাঘ্র সমাজের সে খুব উৎসাহের কারণ তাহা প্রবাদও বলে না। মনু ব্রাহ্মণের যে বৈশ্য বৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আপদ্ধর্ম্ম আনন্দের কারণ নয়। বাঙ্গলাদেশের যে মুষ্টিমেয় লোক এখন উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে তারও অর্দ্ধেককে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনা, দেশে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় নয়। সে পথ হইল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করিয়া, এ যুগের শিল্প বাণিজ্যের যে বিশেষ শিক্ষা, যাহা কেবল উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব, দেশে তাহার ব্যবস্থা করা।

(১০)

দ্বিতীয় কথা কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেলেদের পুঁথিগত এমন কি ল্যাবরাটারীতে পরীক্ষাগত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই

বাঙ্গলাদেশ দেখিতে দেখিতে শিল্পশালায় ও বাণিজ্যাগারে ভরিয়া উঠিবে এমন দুরাশার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষাকে সফল করিবার উপায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে নাই। সে শিক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে দেশের লোকের, হয়ত বা দেশের রাজার উদ্যম বা নিশ্চেষ্টতার উপর। বাঙ্গলার অন্ন সমস্যার জন্য দায়ী তার প্রচলিত শিক্ষা নয়; এবং কেবল শিক্ষার বদল ঘটাইয়া সে সমস্যার পুরণও সম্ভব নয়। বেশ মনে আছে যখন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বি, এস্, সি' পড়াইবার প্রথম আয়োজন হয় তখন অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আর ভাবনা নাই। এই সব বিজ্ঞানে-কৃতবিদ্য ছেলেরা দেশে বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নাভাবের একটা কিনারা করিবে। আজ 'এম্, এস, সি; বি এল্' এ বাঙ্গলার সব উকীল লাইব্রেরী ভর্ত্তি হইয়া উঠিল! ছেলেরা বিজ্ঞান শিখিল বটে, কিন্তু সে শিক্ষাকে দেশের সমাজ ও দেশের রাষ্ট্র কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারিল না।

তারপর শেষ কথা কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা, তা এই। উচ্চ শিক্ষায় যার অধিকার আছে তাকে সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র কাহারও নাই। এখানে উচ্চ শিক্ষিতের জীবিকা উপার্জ্জনের পথে বিঘ্নবাহুল্যের কথা তোলা নিষ্ফল, কেননা জীবিকার অধিকারের চেয়ে এ অধিকারের দাবী কিছু কম নয়। কাজেই সে পথের মাপে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছামত প্রসার বা সংকোচ ঘটান চলে না। কথা এই, আর কোনও ফল বা নিষ্ফলতার প্রমাণে উচ্চ শিক্ষার বিচার হয় না; ঐ শিক্ষাই সে শিক্ষার চরম ফল। কেরাণীরও উচ্চশিক্ষা বিফল নয়, যদিও কেরাণীগিরিতে তা কাজে

লাগে না। কারখানার মালিকেরও সে শিক্ষা অনাবশ্যক নয়, যদিও তার অভাবে টাকা উপার্জ্জনের কোনো অসুবিধা হয় না। জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, এ শিক্ষার অধিকারী কত লোকের সে জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের পরীক্ষা কত বেশী সংখ্যক অধিকারীর কাছে সে শিক্ষা সহজ লভ্য হয়। মানুষের জন্যই জীবিকা, জীবিকার জন্য মানুষ নয়। জীবিকার মাপে উচ্চ শিক্ষাকে কাটিয়া খাটো করার প্রস্তাব বিছানার মাপে শরীরকে ছাঁটার প্রস্তাবের মতই সুবুদ্ধির পরিচায়ক! তা যত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীই সে প্রস্তাব করুন না কেন, আর যত বড় পণ্ডিতই তার সমর্থন করুন না কেন।

(১১)

শিক্ষামন্দিরের বাহিরে আমাদের দেশে শিক্ষা লইয়া যে সব সমস্যা তার কতক কতক দেখা গেল। এইবার বহিরাঙ্গন পার হইয়া মন্দিরের ভিতরে আসা যাক্।

বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষাকে যখন কেবল শিক্ষার মাপেই ওজন করি, কেবল জ্ঞান, ভাব ও রুচির আলোতেই তাকে পরখ করি, তখনও দেখি এ শিক্ষায় আমরা কেহই সন্তুষ্ট নই; এবং এখানেও অসন্তোষের কারণ এক নয় ভিন্ন ভিন্ন।

দেশে একদল আছেন যাঁরা হালে চলতি শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে তাঁরা যখন স্কুল কলেজে পড়িতেন তখন শিক্ষাটা যে রকম পাকা হইত এখনকার ছেলেদের শিক্ষা সে রকম হইতেছে না। দুই শিক্ষার তফাত কোথায়, এবং বর্ত্তমানের শিক্ষা কোনখানে কাঁচা

তাহার অনুসন্ধান করিলে, কথার হেরফের বাদে যাহা বাহির হইয়া পড়ে তাহা এই ;—

পূর্ব্বকার দিনে ইংরেজি, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাটা যেমন পাকা রকমের হইত এখনকার ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা তার কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। তখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দ শিখিবার জন্য অভিধান মুখস্থ করিত, 'গ্রামার' 'ইডিয়ামে' নির্ভুল হইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিত, 'ষ্টাইল' দোরস্ত করিবার জন্য বেন্‌জন্‌সন হইতে স্যামুয়েল জন্‌সন্ পর্য্যন্ত কারো লেখাই কণ্ঠস্থ করিতে বাকী রাখিত না। আর ফলও ফলিত চেষ্টার অনুরূপ। এই সব কৃতবিদ্য লোকের মুখের ইংরেজি শুনিয়া বড় বড় সাহেবদেরও চমক লাগিত; নাম না দিয়া খবরের কাগজে লেখা বাহির করিলে বাঙ্গালীর লেখা না সাহেবের লেখা এ লইয়া তর্ক উঠিত। আর আজ দুই ছত্র নির্ভুল ইংরেজি লিখিতে বি এ পাশ ছেলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে। শিক্ষার অবনতি আর বলে কাকে!

উঁচুদরের ইংরেজি শেখাই উচ্চশিক্ষা কি না এ প্রশ্ন তোলা অবশ্য নিরর্থক। কেননা সে সম্বন্ধে এঁদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। তবে খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে এদের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়ীদের একবারে নিরুত্তর করিবার জন্য এই শিক্ষার দুই একটা অবান্তর মাহাত্ম্যও কীর্ত্তণ করেন। তাঁরা বলেন আমাদের বর্ত্তমানে যা কিছু উন্নতি তার মূলই ত ঐ ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, এবং ঐ ভাষাই হইল বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ঐক্যসূত্র। কিন্তু ইহার পরেই কোন ইংরেজি ইতিহাস আগাগোড়া মুখস্থের উপর বক্তার বর্ত্তমান পাণ্ডিত্য খ্যাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এমনি গম্ভীরভাবে সে কথার সুরু হয়

যে আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির অর্থ তাঁদের মত পণ্ডিত লোকের আবির্ভাব না আর ও কিছু, এবং ভারতবর্ষের ঐক্য ইংরেজি 'ইডিয়ামের' ঠিক কতটা বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, অথবা কোনো কোনো বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের মত হ্রস্বদীর্ঘের বিন্দুমাত্র গোল ঘটিলেই সর্ব্বনাশ, সে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আর সাহসই হয় না।

আমাদের দেশের ঠিক এই দলটিই বাঙ্গালীর স্কুল কলেজে বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা দিবার প্রস্তাবে একবারে চম্‌কিয়া উঠিয়াছেন। চম্‌কাই-বারই কথা! শিক্ষার অর্থই হইল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা; তাকেই যদি খর্ব্ব করা যায় তবে শিক্ষার আর বাকী থাকে কি? কেননা সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, দর্শণ বল, বিজ্ঞান বল, সবই হইল উপলক্ষ্য। যেমন কথাচ্ছলে নীতি শিক্ষা, এও তেমনি নানা ছলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া ভিন্ন পথের মোহে বাড়ীর কথাটাই আর কার ভুল হয়! এঁদের মধ্যে যাঁরা কলেজের অধ্যাপক তাঁরা আরও কঠিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কুপারের কবিতার সৌন্দর্য্য, কি অ্যাডিশনের রসিকতার রস তাঁরা বাঙ্গলা ভাষায় ছেলেদের বুঝাইবেন কেমন করিয়া? সমস্যা গুরুতর। যে সব পুঁথিতে ঐ সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ ও রসিকতার ব্যাখ্যা আছে সেগুলিও যে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা! আর এ কথাও ঠিক অনেক ইংরেজ লেখকের কবিত্ব ও রসিকতা আমরা ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করিতেছি, মাতৃভাষার শাদা চোখে দেখিলে যে ভক্তি নাও টিকিতে পারে। প্রমাণ, য়ুরোপ মহাদেশের লোকেরা, যাঁরা ভাষা শিখিবার উপায় স্বরূপে নহে, সাহিত্য হিসাবেই ইংরেজি সাহিত্য পড়েন তাঁরা হয়ত সে সব লেখকের নামও শোনেন নাই। এমন কি খোদ ইংলণ্ডেই

তাঁদের অনেকে অচল হইয়া উঠিলেন। আমাদের নিষ্ঠা কিন্তু অটল।

যাক্ এই পরিবর্ত্তনভীরু অতীতপন্থীদের কথা ছাড়িয়া দেই। এঁরা নিজেদের ইংরেজি জ্ঞানের যতই বড়াই করুন না কেন, গত শতাব্দীর প্রথমে যাঁরা এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন এঁরা তাঁদেরি বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সংস্করণ। সংস্কৃত পড়িলেই চিত্তে জড়তা আসে, আর ইংরেজি শিখিলেই মন স্বাধীন হয়। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠি বর্ষ বয়সে এ উপকথা বাঙ্গলা দেশের বালককেও বিশ্বাস করান কঠিন।

(১২)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী যে আর, সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে অতীত নয় ভবিষ্যৎ। আগেকার দিনের ইংরেজি শিক্ষার পাকা গাঁথনির সঙ্গে তুলনা হালের শিক্ষার উপর আমাদের বিরক্তির কারণ নয়। কারণ হইল বর্ত্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব, কলার রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর শক্তি ও কৃতিত্বের যে একটা ছবি কতক অস্পষ্ট কতক স্পষ্ট হইয়া এ যুগের বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে শক্তির উদ্বোধনে ও কৃতিত্বের সহায়তায় দেশের প্রচলিত শিক্ষার সামর্থ্যের অভাব। বর্ত্তমানের উপর আমাদের সমস্ত বিরাগেরই মূল এইখানে। যা কিছু এই ভবিষ্যতের প্রতিকূল তা আমাদের অসহ্য। যাহা এর অনুকূল নয় তাহা আমাদের চোখে মূল্যহীন। বিশুদ্ধ ইংরেজির অনর্গল বক্তৃতায় বড় সাহেবের চমক লাগাইবার লোভ আমরা এক রকম

ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমরা ভাবিতেছি সেইদিনের কথা যেদিন বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালী কি ভাবে এবং লেখে তাহার খবর না রাখিলে বড় সাহেবের দেশের বড় পণ্ডিতেরও চলিবে না। বাহিরের লোকের কাণে এ কথা নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন গর্ব্বের মত শুনাইবে। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইহাই অন্তরের কথা এবং সেই কারণেই বাঙ্গালীর শিক্ষার প্রধান কথা।

(১৩)

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীল মোহরে যাঁরা advancement of learning 'জ্ঞানের প্রসার' ছাপ বসাইয়া ছিলেন advancement কথাটার কি অর্থ তাঁদের মনে ছিল বলা কঠিন। অবশ্য আমরা জানি বেকনের যে পুঁথির নাম হইতে কথাটি লওয়া, সে পুঁথির প্রতিপাদ্য হইল, কেমন করিয়া নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার হয়। কিন্তু এও জানি যে পশ্চিমের অনেক কথা পূব দেশে আসিলে অর্থের বদল হয়। সুতরাং অসম্ভব নয় যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীলমোহরে ঐ কথাটার আদি অভিপ্রেত অর্থ, জ্ঞানের 'প্রসার' নয় জ্ঞানের 'প্রচার'। জ্ঞানের সীমা বিস্তার নয়, পূর্ব্বদেশের অন্ধকারে পশ্চিমের আলোক বিস্তার। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা আরম্ভ হইল তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বার্ত্তা দেশের মধ্যে প্রচার করা; বাঙ্গালীকে এই নূতন সাহিত্য ও নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করা। এই জ্ঞান ও বিদ্যা পরের হাত হইতে লওয়াই যে চরম সার্থকতা নয়,

ইহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে ইহাকে বহন করিতে জানিতে হয়, ইহাকে সৃষ্টি করিতে না জানিলে যে ইহাকে আপনও করা যায় না এ কথা তখন বাঙ্গালীর মনে হয় নাই; মনে হইবার কথাও নয়। সে দিন ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে আসিয়াছিল দেবতার দানের মত। আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাকে স্বীকার করিয়া ঘরে তোলার নামই অমৃতত্বের অধিকার। এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী নয় পাতালের ভোগবতী, ইহাকে যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, আর যে মাটি খুঁড়িতে না জানে ইহা যে তার কাছে অমৃত নয়, কেবলই তোলা জল, কখনও ঘোলা কখনও কিছু নির্ম্মল, সে কথা বুঝিবার তখনও সময় হয় নাই। তাই যে শিক্ষার লক্ষ্যই হইল অন্যের আবিষ্কৃত জ্ঞান, অন্যের সৃষ্ট রস, অন্যের আহৃত বিদ্যা কেবলি নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ করান, তাহাকেও আমরা পরম সমাদরে সমস্ত মন দিয়া বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে এ শিক্ষাতেও বাঙ্গালীর মন বেশী দিন নিশ্চেষ্ট থাকিল না। আমাদের মনের যে অংশটা পূর্ব্ব হইতেই সচল ছিল, সেই ভাষা ও সাহিত্যের দিক, এই নূতন শিক্ষা ও ভাবের স্পর্শে নব বসন্তের সাড়া দিল। নব-যুগের অভিনব ভাব প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী, সৌন্দর্য্যময় ভাষা আমরা গড়িয়া তুলিলাম। বাঙ্গলার নবীন সাহিত্য আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পুষ্ট করিতে লাগিল। তবুও এই সাহিত্যকে পরীক্ষা করিলেই নূতন শিক্ষা প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় কাব্য ও রসসাহিত্যবাদে এ সাহিত্যের বেশীর ভাগই অনুবাদ ও সঙ্কলনের সাহিত্য। যে তৈরী ভাব ও চিন্তা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে আসিয়াছে তাহাকেই বাঙ্গলা পোষাকে দেশের কাছে

দাঁড় করান মাত্র। আমাদের সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাও য়ুরোপীয় জ্ঞানে বিজ্ঞানের অতি সাধারণকথা ইংরেজি পুঁথি হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সে যুগই ছিল প্রচারের যুগ। বঙ্কিমের 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের' কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব অতি সাধারণ কথার সংগ্রহও বাঙ্গালী সেদিন 'বিষ বৃক্ষের' লেখনীর অযোগ্য মনে করে নাই।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম যুগে যে অতি-মানুষ-বাঙ্গালী, প্রাচ্য সভ্যতার শিখরে দাঁড়াইয়া মোহহীন চক্ষুতে পশ্চিমের সভ্যতাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের জাতির সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর তাঁর কোথায় লোভ ছিল তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে লর্ড আম্‌হার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে দুইটী কথা খুব সুস্পষ্ট। প্রথম বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখান নাই। দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালীর বুদ্ধির ধারাকে এমন পথে প্রবাহিত করান যাতে জ্ঞানের ভূমি সরস ও উর্ব্বর হয়। দ্বিতীয়ত তিনি চাহিয়াছিলেন য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃক্ষটীকে শিকড়শুদ্ধ দেশের মাটিতে রোপণ করিতে ('planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe') যেখানে আমাদের মনের রসে ও রৌদ্রে, এ দেশেই সে গাছে নব কিশলয় দেখা দিবে, নূতন ফুলে ও নূতন ফলে মানুষের সভ্যতার শোভা ও সম্পদ বাড়াইবে। কিন্তু যে ইংরেজি শিক্ষা দেশে আরম্ভ হইল তাহা রামমোহনের ঈপ্সিত

শিক্ষা নয়। ইহার লক্ষ্য য়ুরোপের জ্ঞানের বৃক্ষ এদেশে রোপণ করা নয়; সেদেশ হইতে কিছু ফুল, ফল, পাতা আনিয়া এদেশের লোকের চোখের সম্মুখে ধরা। যাহাতে ঘর সাজান যায়, কিন্তু বাগান করা চলে না। আর সে ঘরের সজ্জাও নিত্য নূতন ধার করিয়া আনিতে হয়, কেননা জ্ঞানের তোলা ফুল পাতাও এক রাত্রিতেই বাসি হইয়া যায়।

(১৪)

এ পত্রের পর একশ বছর অতীত হইতে চলিল। আজ বাঙ্গালী অন্তরের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনুভব করিতেছি রাজা রামমোহন স্বজাতির মানসিক শক্তিতে যে বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যুক্তি নয়। আজ সাহিত্যে, চিন্তায়, বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর সৃষ্টির বিশ্ব মানবের সভ্যতার সভায় স্থান পাইতেছে, এবং আমরা বুঝিতেছি ইহা কেবল সাফল্যের সূচনা মাত্র। এই সামান্য সফলতার প্রারম্ভকে বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার শক্তি এ জাতির মধ্যে আছে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন এ শক্তিকে পূর্ণ ভাবে জাগাইয়া তোলা। ইহাকে সংহত করিয়া সৃষ্টির পথে, মুক্তির দিকে ছাড়িয়া দেওয়া। ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যাও এই খানেই। আজ বাঙ্গালীর প্রয়োজন সেই শিক্ষায় যাতে জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। নিজের প্রাণে সেই প্রাণের স্পর্শ পায়, যার সঞ্জীবনী রস মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিত্য নূতন ফলপুষ্পে তার দেহকে মণ্ডিত করিতেছে।

কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চলিতেছে সেই প্রথম কালের প্রাচীন শিক্ষা, প্রাণের সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাঠের মূর্ত্তি লইয়াই যার কারবার।

বাঙ্গালীর মনের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যার লক্ষ্য নয়, যার উদ্দেশ্য হইল বাঙ্গালীকে ঘরে বসাইয়া জ্ঞান রাজ্যের, ছাপা ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখা। আজ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাকশালায় অন্ন পাকের আগুনের প্রয়োজন, কিন্তু তার হাতে কেবল আছে টিনের কৌটার তৈরীখাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম।

স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলাই ভাল এখনকার দিনে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য রাজার দেশ হইতে যে সব অধ্যাপকের আমদানী হইতেছে তাঁহারা এ যুগে বাঙ্গলা দেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন। তাহার সহজ কারণ য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যথার্থ যোগ নাই। কেন না য়ুরোপের চিন্তার রাজ্যে তাঁরা কেহ ভাবুক নহেন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কেহ কর্ম্মী নহেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার ফেরিওয়ালাকেও গুরুর আসনে বসাইয়া যে দিন আমরা ফল পাইয়াছি সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। দেশী বা বিদেশী আজ বাঙ্গালীর আচার্য্য হইবার কেবল তাঁরই অধিকার, চিন্তার রাজ্যে যিনি নূতন ভাবনা ভাবিতে পারেন, জ্ঞানের আকাশে নূতন আলো যাঁর চোখে পড়ে। এই আচার্য্যদের সাহায্যেই আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে সফল ও সজীব করিবার একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে বড় বাড়ী, ভাল আসবাব, এমন কি বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সকলি বৃথা। আর এইটী ঘটিলে

সকল অভাবের মধ্যেও আমাদের শিক্ষারও প্রাণ ও শক্তিলাভে বিলম্ব ঘটিবে না।

নূতন সৃষ্টির বেদনার পুলকে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে কলায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে নূতন রস, নূতন ভাব, নূতন জ্ঞানের দিকে তার চিত্ত উন্মুখ। এই নব জাগ্রত সৃষ্টিরশক্তিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় সেই শিক্ষাই এ যুগে বাঙ্গালীর প্রকৃত শিক্ষা। পরের পণ্যে মহাজনী আমরা অনেক দিন করিলাম। এখন শিল্পশালার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি শিল্প বাণিজ্যে, কি ভাবে চিন্তায় দোকানদারী করিয়া তৃপ্তির দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎকে আমরা বরণ করিয়াছি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। স্বল্পতুষ্টির প্রবল প্রলোভন হইতে মানবসভ্যতার বিধাতা বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

বিবাহের পণ।*

আজকাল মস্ত একটা সোরগোলের তর্কের বিষয় হচ্ছে, বিবাহের পণ। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শোনা যায় যে, সমাজে যতগুলি কুরীতি ও কুসংস্কার আছে সবগুলি মিলে আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করে না যতটা করে এই এক বিবাহের পণ। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, নভেলে, সব রকম সাহিত্যেই এ বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা চল্‌ছে; রঙ্গমঞ্চের মার্ফতেও লোকের মনটাকে সু-রাহায় আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে; আর যেই থেকে থেকে দুই একটী কুমারী পরিধেয় সাড়ীর সঙ্গে কেরোসিন তৈল এবং অগ্নির সংযোগ করে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হচ্ছেন, অম্নি এক একটা তুমুল হৈঃ চৈঃ উঠ্‌ছে এবং এমন কি সেই হিড়িকে দু' চারটী উৎসাহী যুবক কাগজে স্বাক্ষর ক'রে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হচ্ছেন যে তাঁরা বিবাহে পণ নেবেন না। কিন্তু এত লেখালেখির ফল যে কি হচ্ছে তা আমিও জানি, আর সব বাঙ্গালীরাও জানেন। বিবাহে পণ নেওয়া আমরা সকলেই বলি মন্দ কাজ, কিন্তু প্রতি-কারের চেষ্টাটা আমার মনে হয় যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত।

* এ বিষয়ে গত কার্ত্তিকের "উপাসনা" পত্রিকায় একটি অতি জোরাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। প্রবন্ধের নাম, "একটি ভাববার কথা"। লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত। এত সাদা কথা এত সিধে ভাবে বলবার ক্ষমতা মাসিকপত্র লেখকদের মধ্যে নিত্য দেখা যায় না।

সম্পাদক।

বিবাহের সময় কেন যে পণের কথা ওঠে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না, মনে করেন যে দেশের শিক্ষিত যুবকেরা একটু সৎসাহস প্রদর্শন ক'রে যেমন তেমন পাঁচপেঁচে রকমের মেয়েদের, শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা সুন্দরী কি কুৎসিতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না ক'রে, কেবল হাত পা আস্ত আছে এইটুকুমাত্র দেখে, বিবাহ কর্‌লেই এই উৎপাত থেকে দেশটা মুক্ত হবে। মেয়ের বাপেরা এবং অপুত্রকেরা বুঝতেই পারেন না যে, ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখে এত নীচপ্রবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে কেন, যে তাদের এবং তাদের বন্ধুবর্গের কুলে-শীলে উৎকৃষ্টা মেয়েদের বিবাহ কর্ত্তে ইতস্ততঃ করে। অনেকে আবার কল্পনার চক্ষে অতীতের সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে কেবল এই বলে আক্ষেপ করেন যে "আহা সেকালে আমাদের বাপ পিতামহের আমলে কোনই হাঙ্গামা ছিলনা, বিয়েতে জোর ৫১৲ পণ ছিল, তাও বরের কুলের উচ্চতা অনুসারে দেওয়া হত—আজকাল কুলের খোঁজে কাজ নাই, দাও কেবল টাকা আর টাকা।" অধিকন্তু কাগজে সহিকরা ছেলেদের কামড় আরও বিষাক্ত—তাঁরা পণ নেন না বটে কিন্তু এত বেশী খুঁতখুঁতে মন নিয়ে আসরে নামেন যে, হয় মেয়েদের ডানাকাটা পরী হতে হবে, তাতেও বোধ হয় কুলাবে না—কিম্বা তাদের অভি-ভাবকদের ঐশ্বর্য্যের বাতাসটা এ রকম বওয়া উচিত যে বর যেন কেবলমাত্র ঘ্রাণ দ্বারা অনুমান কর্ত্তে পারেন যে, এস্থলে দরকশাকশি না করেও, যা চাওয়া যেতে পারে তার অপেক্ষা বেশী পাবেন। অতএব সকলেরি ভাবা উচিত যে এ কু-প্রথা আমাদের দেশে কেন এল এবং এর প্রতিকারই বা কি।

সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ; এমন কি সকল বিষয়ে আদর্শ-যুগ। সে যুগে

কোনও কষ্ট ছিল না, সুতরাং সে যুগের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্; কিন্তু এই যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ প্রথার ততটা চল ছিল না তার কারণ কি? যতদূর আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ দুইটি—প্রথম খাদ্যদ্রব্যের প্রচুরতা, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ। সেকালে বিবাহের সময় স্বামীকে ভাব্‌তে হত না যে সে স্ত্রীপুত্রাদিকে খাওয়াবে কি করে, আর কন্যার পিতাকেও ভাব্‌তে হত না যে জামাতা যদি উপার্জ্জন না করেন তা হলে পুত্রা আর পৌত্রাদির খাওয়াবার কি ব্যবস্থা হবে। খাওয়া পরার অভাব না থাকায় সহজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত হবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল; এবং বালকবালিকা-বিবাহ চলিত হওয়ার দরুণ বর অপেক্ষা বরের ঘরের খবরের আবশ্যকতা বেশী হ'ল এবং বরের বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্যটা বেশী লক্ষ্যের বিষয় হ'ল। জাতিকুল মাপ-কাটি হওয়াতে সমাজে বর কন্যার দর ছেলে মেয়ে হিসাবে সমান ছিল—বিবাহের বাজারে ছেলে ব'লে বরের বিশেষ একটা মূল্য ছিল না এবং কন্যার বিবাহ দিয়ে স্বচ্ছন্দে তাকে ও তার ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সামর্থ্য থাকার জন্য, কন্যার পিতার নিকট কন্যার জন্ম পাপের ভোগ বলে মনে হত না। ছেলেবেলাতে ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়ে গেল, তারপর যার কপালে যে ছেলে যেমন কৃতী হল। কারও স্বামী বা মূর্খ হ'ল, কারও স্বামী বা পণ্ডিতাগ্রগণ্য হ'ল। কোনও কালে কোনও দেশের স্ত্রীপুরুষের সংখ্যায় যে বিশেষ বৈষম্য আছে তা মনে করা ভুল—হয়ত বিশেষ কারণবশতঃ সাময়িক কিছু প্রভেদ থাকতে পারে কিন্তু অচিরেই তা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ততঃ আমার মনে হয় না, যে বাংলাদেশে এই সব অসুবিধার হেতু, ছেলেমেয়ের সংখ্যার বৈষম্য। বহুবিবাহ যখন প্রচলিত ছিল তখন স্ত্রীলোকের

সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা অপেক্ষা দশ বিশগুণ বেশী ছিল না, এবং আজকাল যে, পাত্রের এত অভাব তা census রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে যে এ মনে করা ভুল যে, পুরুষের সংখ্যা মেয়ের সংখ্যা অপেক্ষা কম। আজকাল যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই তার কারণ এ নয় যে বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের খুব উন্নতি হয়েছে, বরং তার কারণ এই যে অন্নসমস্যা এমন উৎকট হয়ে উঠেছে যে ছেলেদের কতকটা উপার্জ্জনের রাস্তায় এগিয়ে না দিয়ে বিবাহ দিতে বরের বাপও ইতস্ততঃ করেন এবং কন্যার পিতাও তেমন ছেলেকে সুপাত্র মনে করেন না। বাল্যবিবাহ ও জাতিকুলের কালে যতগুলি সুপাত্র ছিল ততগুলিই সুপাত্রী ছিল, সুতরাং বিবাহে কোনও গোল ছিল না। আজকাল পাত্রের সংখ্যার অল্পতা না থাক্‌লেও সুপাত্রের অত্যন্ত অভাব। আমাদের দেশের মেয়ের কোনও দাম বাড়ে নি, এমন কি বড়লোকের অশিক্ষিতা মেয়েও গরীবের শিক্ষিতা মেয়ের অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়া—অথচ পক্ষান্তরে কতকগুলি ছেলের, তাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা অনুসারে বা উপাধির অল্পাধিক্য হিসাবে মূল্য বেড়েছে। সকল কন্যার পিতার ইচ্ছা যে এমন পাত্রে মেয়েকে দেন যে তা অন্ততঃ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ না থাকে, কিন্তু দিনকাল দেখে এবং চাকুরী-ডাক্তারী ওকালতীগতপ্রাণ বাঙ্গালীদের অবস্থা দেখে তাঁরা কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপধারী ছেলেগুলিকেই সুপাত্র মনে করেন।

সব মেয়েরই বিবাহ দিতে হবে অথচ তাদের মধ্যে সমাজ এমন কোনও জিনিস দেখ্‌তে শেখেনি যাতে ক'রে একটী মেয়ে আর একটী মেয়ে অপেক্ষা বধূ হিসাবে অধিক বাঞ্ছনীয়া হয়। বেশী লেখাপড়া শেখা অনেক স্থলে দোষের মধ্যেই গণ্য হয়! রূপের অবশ্য একটু

দাম আছে কিন্তু তাও খুব বেশী নহে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে অনেক কিন্তু জামাতা কর্ত্তে পারা যায় এমন পাত্র কম। অতএব ঐ কয়টী সুপাত্রের জন্য মেয়ের বাপদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং তাঁরা নিজেরাই দাম বাড়িয়ে দেন। একজন উপাধিকারী পাত্রের সহিত যে কন্যার পিতা ৫০৲ মাহিনা পান তিনিও বিবাহ দিতে উৎসুক, যিনি ৫০০৲ পান তিনিও আগ্রহান্বিত আর যিনি হয়ত ৫০০০৲ রোজগার করেন তিনিও সুশিক্ষিত বলে তাকে জামাতারূপে পেতে ইচ্ছুক। ছেলে এ অবস্থায় নিলামে চড়ে; এবং এই তিন জনের ডাকাডাকিতে ছেলের দাম এত বেশী চড়ে যায় যে প্রথমোক্ত লোকের বসতবাটী বন্ধক পড়ে। একটু অনুধাবন করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, বরপণটা প্রত্যক্ষভাবে বরের বাপ স্পষ্টতঃ চাইলেও কন্যার পিতারাই জোর করে তাঁদিকে দেন। আমাদের দেশে যখন বিবাহ কোর্টশিপ করে হয় না, এবং যখন বরের পিতা বা অভিভাবক বধূ বাছাই করে থাকেন, আর মেয়েরা যখন সকলেই এক দরের, এমন অবস্থায় কোনও কারণ আছে কি, যে কন্যার পিতা যে টাকাটা জোর করে দিচ্ছেন তা কেন ফেলে দেওয়া হবে, বা বরের পিতা কেন একজন বড় কুটুম্ব কর্ব্বেন না? ব্যাপার এমন ত নয় যে ছেলের বিবাহ না দিয়ে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হচ্ছে, তবে তিনি নিজের মনোমত স্থানে বিবাহ দেবেন না কেন? এ অবস্থা যে-কোনও দেশের পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের অবস্থা বলতে হবে যখন খাওয়াতে পার্ব্ব না মনে করে লোক বিবাহ করে না, এবং সন্তানাদি জন্মালে আরও কষ্ট বাড়বে মনে করে, লোকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাতে বাধা দেয়। কিন্তু প্রায় দেশই যখন

এইরূপ দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট এবং ভারতবর্ষও যখন তা হতে মুক্ত নয় তখন বিবাহও যে অর্থনীতি দ্বারা শাসিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? বিবাহের পর সন্তানাদি হলে তাদের কি খাওয়াব এবং তাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয় কোথা হ'তে আসবে এই সব ভেবে ছেলের বাপ আর ছেলের বিবাহ অল্প বয়সে দেন না। এই মনে করে যে, পাশকরা জামাতা অন্ততঃ করে খেতে পারবে, কন্যার পিতার পাত্র সন্ধান করতে করতে কন্যার বালিকা অবস্থা উত্তীর্ণ হয় এবং পিতাও বিবাহের পর একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হন। এর প্রতিকার কিন্তু হাহুতাশ নয়, সভা সমিতি বক্তৃতা নয়, এমন কি ছেলের কিম্বা ছেলের বাপের "পণ চাহিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও নয়। শ্রীমতীরা আত্মহত্যা করে তাঁদের পিতাদের সম্পত্তি রক্ষা করেন বটে কিন্তু সামাজিক লাভ যে তাতে কতদূর হয় ঠিক বলা যায় না—প্রত্যুত আমার মনে হয় যে সাধারণ লোকেরা এই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাদের বাহবা দিয়ে এবং তাদের কার্য্যের অনুমোদন করে সমাজকে দুর্ব্বল করছেন এবং একটা নূতন প্রকারের সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করছেন। এরূপ স্থলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তবে উপায় কি? যে কয়টী উপায় আমার নিকট সমীচীন মনে হয় তা এইখানে লিখ্‌ছি।

১। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপের মূল্য কমানো। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা লোকেরা অপরের অপেক্ষা সহজে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে ততদিন উপাধির দাম কন্যার পিতাকে নগদ গুণে দিতেই হবে। পাসের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমেচে বলে মনে হয়, এবং আজকাল অনেকে শুধু পাসকরার তুলনায় চাকুরে ছেলেকে বেশী পছন্দ করেন। আজকাল যে রকম চাকুরির বাজার তাতে পাসের দাম

ক্রমশঃ কম্‌বে। এর মূল্য দ্রুত কমাতে হ'লে উচ্চ শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক। আশুবাবুর আমিলে যে বেশী ছেলে পাস হচ্ছিল তাতে দেশের অন্য কোনও উপকার হোক বা নাই হোক, শুধু পাস করা ছেলেই যে সুপাত্র এই ভুলধারনা অনেকটা দূর হচ্ছিল। যখন সকলে দেখ্‌বে যে অনেক পাস করা ছেলে উদরান্নের সংস্থানে অপারগ তখন লোকে উপার্জ্জনক্ষম ছেলেদেরই সুপাত্র মনে কর্‌বে—তা তারা যে কোনও সদুপায়েই উপার্জ্জন করুক না কেন। কতকগুলি লোক অবশ্য চিরকাল থাকবেন যাঁরা কেবল বিদ্যা দেখেই কন্যার বিবাহ দেবেন, কিন্তু সাধারণতঃ কন্যার পিতা এইটুকু দেখবেন যে এমন পাত্রে মেয়ে দিচ্ছেন যে তার অন্নবস্ত্রের কষ্ট না হয়।

২। প্রচুর সংখ্যায় উপার্জ্জনক্ষম সুপাত্রের সৃষ্টি এবং কেবলমাত্র কয়েকটী ব্যবসায়কে সম্মানের চক্ষে না দেখা। কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক ছেলেদের অবলম্বন কর্‌তে হবে, লোকেদের মন থেকে এ সব কার্য্যের হীনতা সম্বন্ধে যে ভুলধারণা আছে তাহা অপসৃত কর্‌তে হবে, এবং তাদের দেখাতে হবে যে এ সব কার্য্য যারা করে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেবলমাত্র পাসকরা ছেলে অপেক্ষা সহজে হয়। মোট কথা কন্যার পিতাদের জানতে হবে যে এ সব উপায়ে উপার্জ্জন-ক্ষম ছেলেরাও সুপাত্র।

৩। সুপাত্রীর সৃষ্টি। আজকাল মুড়ী মিছরির এক দর। কি রকমের শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া উচিত তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যে কোনও শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হ'ক না কেন মেয়েদের সুশিক্ষিতা করা উচিত এবং সাধারণকেও এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যে ঐ সুশিক্ষিতা পাত্রীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপাত্রী, অতএব

অধিকতর বাঞ্ছনীয়া। ছেলেদেরও পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তারা যেন এ জ্ঞান লাভ করে যে জীবন কৃতার্থ কর্ত্তে হ'লে ঐ শিক্ষিতা সুপাত্রীই লাভ কর্ত্তে হবে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হ'লে বিবাহের আগ্রহটা উভয় পক্ষের হবে এবং পাত্রের মূল্য নিয়ে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হবে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে এক সুপাত্রেই রক্ষা নেই, আবার সুপাত্রী সৃষ্টি আর সুপাত্রীর জ্ঞান—এতে মেয়ের কেনা বেচা আরম্ভ হয়ে কুরীতিটা আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তা নয়, একটু ভেবে দেখলেই সকলে দেখ্‌তে পাবেন যে মেয়ের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দাম কম্‌বে।

আগ্রা ১৩ই মার্চ্চ ১৯১৮ — শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী।

নবীন সাহিত্যিক।

—:০:—

"বয়সে বালক বচনে নয়
সে ছেলেকে মন্দ সকলে কয়"

সাহিত্যের আসরে ঠিক এ কথাটী না হলেও মাঝে মাঝে এবম্বিধ মন্তব্য শোনা গিয়ে থাকে। এবং পূর্ব্বপক্ষ এ মন্তব্যের নিরাসকল্পে বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনেকানেক সাহিত্যিকের নজির এনে হাজির কর্‌লেও সমালোচকের মন তাতে ভেজে না! বরং উল্টো বিপত্তিই দাঁড়ায়! কারণ, তত্তৎ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সব লেখক নাকি এক এক জন "অবতার" কাজেই তাঁদের পক্ষে যা "লীলাখেলা", সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই দূষণীয়।

আমার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না। সামাজিক সার্থকতা ওর যাই আর যতই থাক্ না, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস উক্ত শ্লোকাংশ নিতান্ত নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয়। বচন-বিন্যাসমাত্রকে সাহিত্য সৃজন, আর সাহিত্যকে সর্ব্বথা সামাজিক পদার্থ বলে ধরে নেওয়াতেই আমাদের ওরূপ ভুল হয়ে থাকে। সাহিত্য যদি স্থান, কাল এবং সমাজকে অতিক্রম করে' সুদূরকে' সন্নিহিত করবার, অজানাকে প্রকাশ করবার, অবহেলিতকে অনুরঞ্জিত করবার সঙ্কেত না জান্‌ত; মানুষের ভবিষ্যতের আশার নীহারিকাকে যদি আকার দিতে না

পারত, শতেক পাকে তা যদি বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার বজ্র-আঁটুনীতেই বাঁধা পড়ে থাকৃত—তবে তার যে বিশেষ আদর হতো সমাজে, এমন ত আমার বোধ হয় না! কারণ, ওরূপ বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের ত্রিবিদ্যা ত জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ঘরে ঘরে কাগজে কলমে না হোক কায়মনোবাক্যে আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা সবাই সাধন করে আস্‌ছি।

অভিজ্ঞতা সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সন্দেহ নেই;—কিন্তু অনুভূতিই হয়েছে সাহিত্যের প্রাণ। বেদমন্ত্রে যতক্ষণ না মৃৎ-প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, ততক্ষণ তা যেমন নিতান্ত জড়সমষ্টিমাত্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্য-সৃজন-প্রয়াসও তেম্নি কথার কথা। অস্থি-সমাবেশপরিশূন্য জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু চেতনালেশ-পরিহীন প্রাণীর কল্পনাও অসঙ্গত।

অধিকাংশ স্থলে সাহিত্যের সমালোচনার ছলে আমরা অভিজ্ঞতার মাপকাটীতে তার জড়-দেহটারই জরীপ করে থাকি; তারি ফলে, নির্ভুল সমালোচনাও অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

অনুভূতি পদার্থটী আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার সাথে কোনো আপেক্ষিক অনুপাত রক্ষা করে চলে না। তা' যদি চল্‌ত', তা' হ'লে সামাজিক উপন্যাস কেবল সমাজপতি মহাশয়দের হাত থেকে বেরুত; অবিনাশ বাবুও হয়ত "বার্ষিক উপন্যাস" লিখ্‌তেন না; আর, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন "রায় আর "রিপোর্ট" লিখেই কেটে যেত—অন্ততঃ রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন, দুর্গাদাসের মত নাট্যসাহিত্য তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতো না!

সাহিত্য বৈষয়িক-অভিজ্ঞতা-গত-প্রাণ নয় বলেই এ ক্ষেত্রে বয়সের বিচার নেই! "নবীন-সাহিত্যিক", "প্রবীন-সাহিত্যিক" আদি করে'

কথাগুলো নিতান্তই নিরর্থক। সাহিত্যে দাদা মশাই-এর লম্বাই চৌড়াই ও যেমন নিষিদ্ধ, খোকা বাবুর চাঁদ ধরাবার আব্দারও তেম্নি অচল! "অমৃতং বালভাষিতং" সাহিত্য-বিচারে এ কথা খাটে না। কারণ সাহিত্য ত "ভাষিত" হয় না। আর, "শতংবদ, একং মালিখ" এ যুগ্ম অনুজ্ঞার যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে আশা করি সবাই নিঃসন্দেহ!

সত্য এবং সতেজ অনুভূতির দ্বারা উদ্দীপ্ত না হ'লে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি কখনো স্বাভাবিক বা হৃদয়-গ্রাহী হতে পারে না! পঞ্চাশোর্দ্ধে তৃতীয় পক্ষে ষোড়ষীর পাণিপীড়ণ করে' অলঙ্কারের শিঞ্জিনীতে প্রীতির অভিনন্দনের অভাব দূর করবার প্রয়াস যেমন নিতান্তই পণ্ডশ্রম, অনুভূতির পরশ-মনির অভাবে অভিজ্ঞতার ইঁট পাট্‌কেল দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির আশাও ঠিক তেম্নি বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনার অবতারণা যাঁরা করেন পাঠক-সাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের নয়। এবং উক্ত আনাড়ি সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ "আক্কেল দেবার" অভিপ্রায়েই সাহিত্য সৃষ্টির নামে তাঁরা নিত্য নূতন "সাহিত্য-পাঠ" রচনা করে থাকেন। পরের অজ্ঞতাকে অবশ্য স্বীকার্য্য, আর নিজের বুদ্ধিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে' নিয়েই তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্র-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, তাঁদের অনায়ত দৃষ্টির সম্মুখে সাহিত্যের প্রসার স্বতঃই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।

"শিক্ষা" জিনিসটা অত্যন্ত দরকারী—তাতে আর সন্দেহ কি? দেশ যাতে সুশিক্ষিত হয়; দেশের লোকের মতি-গতি রীতি-নীতি যাতে বিপথগামী না হ'তে পারে; দেশের স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই যাতে স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য পালনে উন্মুখ হয়ে ওঠে; এককথায়, দেশের যেখানে যেমনটা হওয়া উচিত সেখানে ঠিক তেমনটা যাতে

গড়ে ওঠে, আর যেখানে যা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার, সেখান থেকে তা উঠে যায় যাতে, এমন-তর শিক্ষার সূত্রপাত এবং অনুষ্ঠান যে, দেশের মনিষিগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ কথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মানুষের অভাব এত বহুবিধ, প্রতিভা এত বহুমুখী আর প্রকৃতি এতই বিচিত্র যে দেশের সমুদয় সাহিত্য প্রচেষ্টাই যে সেই একই সাধারণ সূত্রের অনুবর্ত্তী হবে—এমন আশা করাও সমীচীন হবে না।

সাহিত্য আর সমাজে ত' গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নয়। সাহিত্য রসিকের সাথে সমপ্রাণতা স্থাপনাই হয়েছে সাহিত্যিকের চিরদিনের লক্ষ্য। নিবিড় আলিঙ্গনে পাঠকের প্রাণে প্রাণে অনুভূতির আনন্দ এবং সম-বেদনার আবেগ ছড়িয়ে দেওয়াই ত' সাহিত্যিকের কাজ! যে নব চেতনার উৎস সাহিত্যিকের প্রাণে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে, ভাষার সহায়তায় তাকে দিকে দিকে দেশে দেশে প্রেরণই হয়েছে সাহিত্যিকের সাধনা। যে ভাবনায় সাহিত্যিক বিভোর তা অপরের পক্ষে অভাবনীয় নয়, অচিন্ত্যও নয়; এমন কি অনেকের কাছে অননুভূত পূর্ব্বও না হ'তে পারে!—এই ভরসাই ত সাহিত্যিককে মুখর করে তোলে! নিজের অনুভূতিকে পরের কাছে যাচাই কর্‌বারও যে একটা আগ্রহ আছে! সেই আগ্রহের ঐকান্তিকতাতেই ত' সাহিত্য-সাধকের মানস-মূর্ত্তি তার লেখার ভিতরে বিকশিত হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে গুরু নয়, উপদেষ্টা নয়—সখা! লেখক আর পাঠক উভয়েই সেখানে সাহিত্য-সেবী। লেখক আর পাঠকের এই যে ঐক্যবিধান এই খানেই সাহিত্যের সার্থকতা! সাহিত্য থেকে যদি কখনো সমাজের কোন "উপকার" হয় তা' হলে তা' এই পথেই আস্‌বে! তার

অগ্রদূত হবে—আর আগমনী গাইবে তারাই যারা চির-নবীন চির-কিশোর। আর যারা এর খাঁটি আগ্‌লে রাখ্‌বে—হোক না তারা প্রবীণ হোক না তারা বিজ্ঞ—কিন্তু সাহিত্যক তারা আদৌ নয়।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

পত্র।

—ঃ০ঃ—

শ্রীমান চিরকিশোর—
কল্যাণীয়েষু।

একটা খবরের মত খবর দিয়ে এ চিঠিটে সুরু কর্‌তে পারছি নে, কেননা দেশ বিদেশের সংবাদ পত্র ঘেঁটে এমন কোনও সংবাদ খুঁজে পেলুম না, যাতে করে মানুষের পিলে চম্‌কে দেওয়া যায়। তারপর জনরবের কলরবও অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। গেলবার তোমাকে যখন চিঠি লিখি, তখন একটি বিজুলি-বার্ত্তার ধাক্কায়, দেশের সুস্থ শরীর অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; এবং সে ব্যস্ততার ছোঁয়াচ যে আমার গায়েও লেগেছিল, তার পরিচয় ত ঐ পত্রেই পেয়েছ। সুস্থ শরীরে কে আর টনিকের খোঁজে ফেরে?

কিন্তু শুনে সুখী হবে যে, নব ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, এই কলিকাতা-মহানগরীতে আমরা সবাই আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি। এ সহরে একটা হুজুগ নিয়ে লোকে বেশী দিন কাটাতে পারে না, আমাদের নিত্য নতুন গুজব চাই। আপাততঃ নতুন গুজবের অভাবে, আমরা সকলে সুবোধছেলের মত নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করেছি। রাজনীতিকেরা মন দিয়েছেন অর্থসংগ্রহে আর আমরা সাহিত্যিকেরা, বাক্য সংগ্রহে। এর কারণ ভারতবর্ষের বায়ুকোণে

যে ঝড়ো-মেঘ দেখা দিয়েছিল, তা এক নিমেষে কেটে গেছে। এ মেঘ যে কেটে যাবে, তা আমাদের বোঝা উচিত ছিল, কেননা "মানুষ আমরা নহিত মেষ"। আমরা যে তা বুঝিনি তার কারণ আমরা কবির কথাকে গানের দরবারে আদর করি—প্রাণের কারবারে আমল দিই নে।

সে যাই হোক্ এখন জানা যাচ্ছে যে, এ দেশের উপর জর্ম্মাণ বাটপাড়ির কথাটা হচ্ছে একেবারে উদ্ভট। কিম্বদন্তির ভিতর যতটুকু ইতিহাস থাকে ওগুজবের ভিতর তার বেশী আর কিছু নেই। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের এই নীল আকাশে ঐ লাল মেঘের ইন্দ্রজাল রচনা করবার কি দরকার ছিল। ঘরপোড়া-গরু সিঁদুরেমেঘ দেখলে যে ভয় পায়—এ প্রবাদ কি ইংরেজিতে নেই? তবে লাভের মধ্যে এই যে, এই ধাক্কায় আমাদের মনটা একটা বড় রকম ঝাঁকুনি খেয়েছে এবং আশা করি সেই সঙ্গে কতকটা সচেতনও হয়েছে।

অতঃপর শুন্‌ছি এ যুদ্ধের হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার ভারতবর্ষের বায়ুকোণে নয়—ফ্রান্সের ঈশানকোণেই হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী খুব সম্ভবতঃ খাট্‌বে। ইউরোপের অনেক বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের যাহয় একটা হেস্তনেস্ত ইতিপূর্ব্বে বহুবার ঐ কোণেই হয়ে গেছে। এযুদ্ধ এতটা অপূর্ব্ব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের নজির, অনেকের মতে এক্ষেত্রে খাটবে না। বিশেষতঃ এই যখন পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। এযুদ্ধের আকার যে বিপুল, তা ত সকলেই জানে এবং অনেকে বলে এর উদ্দেশ্যও অতুল। এ লড়াই মাটির উপরে হলেও মাটির জন্য নয়। স্থূলদৃষ্টিতে এ ব্যাপার দেহের সঙ্গে দেহের সংঘর্ষ বলে বোধ হলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে এ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার লড়াই।

আত্মার জয় যে দেহের জয়ের উপর নির্ভর করে এ সংস্কার অবশ্য আমাদের নেই। আমাদের ধারণা দেহের পরাজয়েই আত্মার জয়। কিন্তু জর্ম্মাণরা উল্টো বোঝে। এই দেহাত্মবাদীদের মতে বাহুবলই আত্মবল। তাই তোপের মুখ দিয়ে তারা তাদের culture প্রচার কর্‌তে চায়। এ দেশের আর্য্য-সমাজের আমিষের দল নিজেদের বলেন, culture party কিন্তু নিরামিষের দল তাঁদের বলেন vulture party। ইউরোপের আর্য্য-সমাজেও জর্ম্মাণরা হচ্ছে নিজেদের মতে culture-এর দল, এবং অপরের মতে vulture-এর দল। জর্ম্মাণ-ইগল যে মহা-শকুন, এ দম্ভ জর্ম্মাণরাও করে থাকেন। অতএব এ যুদ্ধ যে, জর্ম্মাণীর culture ওরফে vulture-এর বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার যুদ্ধ, এ কথা মেনে নিতে কোনই আপত্তি নেই। তবে এ যুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই যে মানুষের শেষ যুদ্ধ—এরূপ অনুমান করবার কোনও কারণ নেই। এ যুদ্ধের ফলে যদি বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সত্ত্বসাব্যস্ত হয়ে যায়, তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে, বিশ্বমানবের সাম্যের সত্ত্বসাব্যস্তের জন্য—তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে বিশ্বমানবের মৈত্রির জন্য। সেইটে হবে শেষ যুদ্ধ, কেননা তারপর পৃথিবীতে যুদ্ধ করবার আর কোনও লোক থাক্‌বে না। এবং সেই সুযোগে বুদ্ধদেবের শেষ অবতার ভগবান মৈত্রেয় ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। থিওজফিষ্টরা যে ঘোষণা কর্‌ছেন যে, তিনি ইতিমধ্যে দক্ষিণ-মথুরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে এখন গোকুলে বাড়ছেন—সে সুসমাচার মোটেই বিশ্বাস্য নয়।

তুমি ভাব্‌ছ যে আমি নেহাৎ বাজে বক্‌ছি। অবশ্য তাই কর্‌ছি। এ যুদ্ধের নাম মুখে আনবা মাত্র, মানুষে যে বেজায় বাজে বক্‌তে আরম্ভ

করে, তার এক লাইব্রেরী প্রমাণ আমি যেখানে বলো, সেই সাহিত্যের আদালতে দাখিল করে দিতে পারি। তার দেদার দলিল আমার ঘরেই মজুত আছে। যদি জিজ্ঞাসা করো, এই সব বাজে বকুনি পয়সা খরচ করে সংগ্রহ করবার প্রয়োজন কি? বল্‌ছি। ইতিহাস মাত্রেই যে উপন্যাস এবং উপন্যাস মাত্রেই যে ইতিহাস এ আমার চিরকেলে বিশ্বাস। এবং এ বিশ্বাসের অন্ততঃ প্রথম পদটা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, আমাদের চোখের সুমুখে, দিনের পর দিন, ইতিহাস যে কি পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে তারি প্রমাণ জড় করছি। এত খেলাপ এজাহার মানুষে বোধ হয় আদালতেও দেয় না। তবে বৈজ্ঞানিক-ইতিহাস যে কাঁঠালের আমসত্ত সে জ্ঞান এক বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর সকলেরই আছে। এতেই বাঁচাও। জর্ম্মাণ দেশে Treitsche যে এত লোকমান্য এবং তাঁর ইতিহাস যে এত লোকপ্রিয়, তার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জন্মকালা। কারও কথা তাঁর কাণে ঢোকে নি বলে তাঁর কথা জর্ম্মাণির সকলের কাণে ঢুকেছে। শুধু ঢোকে নি, কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে, আকুল করে জর্ম্মাণের প্রাণ। তিনি যদি fact-এর বড় একটা ধার ধার্‌তেন তাহলে কি তিনি অমন ইতিহাস রচনা কর্‌তে পার্‌তেন?

দেখ্‌তে পাচ্ছ এক কথা থেকে আর এক কথায় গিয়ে পড়্‌লুম। চিঠি লেখার দোষই এই যে, তা লিখ্‌তে লিখ্‌তে লেখার খেঁই হারিয়ে যায়। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলুম সে হচ্ছে এই যে, এযুদ্ধ যে ক্ষেত্রেই পঙ্কত্ব পাক্, অতীতে ইউরোপের অনেক যুদ্ধেরই ঐ ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর সীমান্ত প্রদেশেই গোর হয়েছে। সেকালের যুদ্ধ জমির জন্য করা হত বলে' সেকালের ইতিহাস জিওগ্রাফীর উপরেই গড়ে

উঠেছে। অন্ততঃ পোনেরো'শ বছর ধরে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর ঐ মধ্যদেশ নিয়ে কত জাতি যে কত লড়াই করেছে তার আর লেখাজোখা নেই। ঐ প্রদেশ মানুষের এত রক্ত পান করেছে যে ওদেশে যে আঙ্গুর ফলে তার মদের রং আজও লাল; আর সে মদ উদরস্থ কর্‌লেই মানুষের মাথায় খুন চড়ে যায়। ইউরোপের মধ্যযুগে এই মধ্যদেশে জাতিতে জাতিতে যে কি রক্তারক্তি করেছে তার বিপর্য্যয় কাহিনী মধ্যযুগের যে কোন ইতিহাসে দেখ্‌তে পাবে। সে বিবরণ এত কুটিল আর এত জটিল যে তাকে সরল করবার ক্ষমতা আমার নেই। যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে এই কোস্তাকুস্তির কারণ কি? ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর বিচ্ছেদের একটি সরল রেখা বার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ তারা কাগজে কলমে নয় ঢাল তলোয়ারে, যার সমাধান করবার এ যাবৎ বৃথা চেষ্টা করেছে, সে হচ্ছে একটি জ্যামিতির সমস্যা। এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে সংসারের কোন সমস্যার সরল মীমাংসা করবার চেষ্টা থেকেই যত মারাত্মক জটিলতার উদ্ভব হয়। আর মানুষ যে সরল পথ খোঁজে তার জন্য দায়ী তিনি, যিনি মানুষকে সরল রেখার সন্ধান দিয়েছেন, অর্থাৎ ইউক্লিড।

ভাল কথা ইউক্লিডের নাম করতেই মনে পড়ে গেল যে, ইউক্লিডের রচনার রূপ নেই একথা বলায়, আমার জনৈক অতি নিরীহ বন্ধু মহা রাগান্বিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন যে, যে-রূপের ভিতর কাম-গন্ধের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই, সে রূপের সাক্ষাৎ একমাত্র জ্যামিতির ভিতরেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুটি হচ্ছেন একজন পাকা জ্যামিতিক। "জ্যামিতিক" শব্দটি কলাপের ব্যাকরণে সুসিদ্ধ হয় কি না জানি নে, কিন্তু আলাপের ব্যাকরণে তা প্রসিদ্ধ হয়েছে।

অতএব ওশব্দটি প্রবন্ধে না চল্লেও, পত্রে চলে। অন্ততঃ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, জ্যামিতিক শব্দ বাংলাভাষায় না থাক্‌লেও জ্যামিতিক লোক বাংলাদেশে ঢের আছে, এমন কি শিশুদের মধ্যেও ওদলের অভাব নেই। ত্রিশমাস বয়েসের আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, এই মিনিট খানেক আগে, আমার সোণার ঘড়িটি নিয়ে মেজের উপরে ঘড়ি পেতে, বৃত্তকে চতুষ্কোন করবার চেষ্টা করছিল; আমি বাধা না দিলে, সে সমস্যার সে যে অতি সহজেই সমাধান কর্‌ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থেকে তাকে নিরস্ত করায় সে যে কেঁদে পাড়া মাথায় কর্‌ছে তাতেও তার দোষ দেওয়া যায় না। ছোট ছেলেদের স্বভাবই এই যে তাদের কোনও স্বভাব নেই। তারা বড়দের যা কর্‌তে দেখে তাই কর্‌তে শেখে। আমরা যখন ভারতবর্ষের যেখানে যা কিছু গোল আছে তাকে চৌকোষ কর্‌তে উদ্যত হই, আর আমাদের গুরুজনেরা সে কার্য্যে বাধা দেন, তখন আমরা কান্না ছাড়া আর কি করি।

আমার জ্যামিতিক বন্ধুকে আমি এই কারণে মান্য করি যে তিনি, কোন কিছুরই আকার বদলাতে চান না। আকারের উপরে তাঁর ভক্তি এত নৈসর্গিক যে তিনি মনে করেন যে, দ্রব্যের গুণ তার আকারের উপরেই নির্ভর করে। রসগোল্লার সঙ্গে জিবে-গজার স্বাদের পার্থক্যের একমাত্র কারণ যে, প্রথমটির আকার জ্যামিতির এবং দ্বিতীয়টির Conic-section-এর অন্তর্ভূত, তাঁর একথা অবশ্য আমি মানিনে। কিন্তু একথা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে তিনি এক বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে বিজ্ঞান নয়,—আর্ট, এ জ্ঞান আমি তাঁর প্রসাদে লাভ করেছি। এ

কথা শুনে লোকে চাই কি হাসতেও পারে, অতএব দেখা যাক্ এর স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

আমরা সকলেই জানি, আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু যা প্রকৃতির হাতে নেই এবং যা মানুষে নিজের মন ও নিজের হাত, এ দুয়ের সহযোগে গড়ে তোলে। ইউক্লিড যা সব নিয়ে কারবার করেন তার কোন মূর্ত্তিই প্রকৃতির রাজ্যে কুত্রাপি কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে সরল রেখা হচ্ছে তাঁর শাস্ত্রের অর্দ্ধেক সম্বল, সে রেখা—এ বিশ্বে কোথায়ও নেই; আর এ পৃথিবীতে যেখানে ওরেখার সাক্ষাৎ পাবে সেখানেই বুঝতে হবে যে তা মানুষের হাতে গড়া। তারপর ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পৃথিবীতে নানা আকারের থাক্‌লেও সম-ত্রিকোণ সম-চতুষ্কোণ প্রভৃতি প্রকৃতির ভাণ্ডারে আদপে নেই। ওসব আকার মানুষে আগে কল্পনা করে' তারপরে রচনা করেছে। প্রকৃতি যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন তাকে সম্পূর্ণ করাই মানুষের আসল কাজ। পৃথিবীতে যা আছে সে সব হচ্ছে আগাগোড়া বিষম। আর ইউক্লিড যেসব ত্রিকোণ চতুষ্কোণের মর্ম্মোদ্ধার করেছেন, সে সব হয় সম, নয় অসম, কিন্তু একটিও বিষম নয়। বিজ্ঞান খোঁজে fact অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ, কিন্তু আর্ট চায় তার সুরূপ। সুতরাং যা কুটিল, আর্ট তাকে সরল করে নেয়, যা বিষম তাকে সুষম করে নেয়—যা বিবাদী তাকে সম্বাদী, অনুবাদী করে নেয়; এক কথায় সকল বিরোধের সমন্বয় করে', তার সামঞ্জস্য ঘটায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শুধু আমি নই সবাই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে ইউক্লিডের জ্যামিতি, আথেন্সের পার্থিনিনের মত, ফিডিয়াসের ভিনাসের মত একটি অপূর্ব্ব ও অবিনশ্বর work of art। প্রত্যুদাহরণের দ্বারা এর আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি। হালে ইউক্লিড ভেঙ্গে

এক রকম বৈজ্ঞানিক জ্যামিতি তৈরি করা হয়েছে। সে জ্যামিতি দেখলে যে, ভদ্র-সন্তানের গায়ে জ্বর আসে, তার কারণ তাতে মাল ঢের বেশী থাক্‌তে পারে কিন্তু গড়ন মোটেই নেই। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা গর্দ্দভের কাছে সেতু হতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে তা পিরামিডেরই মানসী-মূর্ত্তি এবং তা আর্ট হিসেবে পিরামিডের মতই উচ্চ।

আর এক কথা ইউক্লিডের জ্যামিতি যে গ্রীসের সকল আর্টের স্বগোত্র, তার কারণ সে-সকল আর্টের ভিতরেও জ্যামিতি আছে। পার্থিনন্‌ের সকল রেখাই সরল রেখা এবং তা আকারে চতুষ্কোণ এবং তার সকল ভূষণ ত্রিকোণ, অবশ্য সম-ত্রিকোণ আর অসম ত্রিকোণ, বিষম নয়। গ্রীকদের এ জ্ঞান ছিল যে আকাশই বস্তুকে রূপ দেয় তাই গ্রীসের স্থাপত্যে, রেখা ও রেখার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ আছে অর্থাৎ আকাশের স্থান আছে। মানুষের বন্ধুর দেহটাকে যতটা সরল রেখার কাছাকাছি আনা যায় গ্রীক-ভাস্করেরা তা কর্‌তে ত্রুটি করেন নি। গ্রীসের Statue-এর দেহকে সত্যসত্যই দেহযষ্ঠি বলা যায়। আমাদের দেশের ভাস্কর্য্যে দেহের যে অঙ্গ উন্নত তাকে আরও উন্নত করা হয়েছে আর যে অঙ্গ অবনত তাকে আরও অবনত করা হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জাতিভেদ অস্বাভাবিক রকম ফুটিয়ে তোলা ও পিটিয়ে ফেলা হয়েছে। উঁচু-নীচুর জ্ঞান আমাদের তুল্য আর কোন জাতের আছে? গ্রীসের ভাস্কর্য্যের পদ্ধতি ঠিক এর উল্টো। সে দেশের শিল্পীরা দেহের সুষমা ও সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ করবার জন্য যা অসম তাকে সম করে তুলেছে আর যা বিষম তাকে অসম করেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাম্য ও মৈত্রের উপরেই যে দেহের সৌন্দর্য্য

নির্ভর করে এ সন্ধান তারা জানত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আর্ট অবশ্য গ্রীসের পথেও চলেনি, ভারতবর্ষের পথেও নয়। এ যুগের শিল্পীদের Motto হচ্ছে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। অর্থাৎ তাঁরা আর্টকে বস্তুতন্ত্র কর্‌তে গিয়ে নিজেরা হয়ে পড়েছেন অপদার্থ যন্ত্র।

ইউক্লিডের জ্যামিতিকে যে, লোকে একনজরে আর্ট বলে চিন্‌তে পারে না, তার কারণ অপর সকল আর্টের উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি, আর তাঁর আর্টের উপাদান আকাশ। ইউক্লিডের হাতে যা ধরা পড়েছে সে সব হচ্ছে ত্রিদল চতুর্দল আকাশকুসুম। সুতরাং তাঁর রচনা শুধু আর্ট নয়, চরম আর্ট। তিনি যে, ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বৃত্ত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেছেন—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসীমকে সসীম করা। ঐ সব ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ভিতর অসীম আকাশ এমন নিখুঁত ভাবে সসীম হয়ে রয়েছে যে তার একটি বিন্দু নড়চড় কর্‌লে তার রূপের সর্ব্বনাশ হয়।

জ্যামিতিকে আর্ট বলায় আমি ওবস্তুকে খেলো করছি নে। মানুষে কেন যে আর্টকে, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির নীচে আসন দিতে এত ব্যস্ত তার রহস্য আমি আজও উদ্ধার কর্‌তে পারিনি। এব্যাপার আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, কেননা মানুষের ব্যবহারে দেখ্‌তে পাই যে, যে বিজ্ঞান দর্শনের ভিতর আর্ট আছে, সেই বিজ্ঞান দর্শনই মানুষকে মুগ্ধ করে। প্লোটার দর্শন যে আগাগোড়া আর্ট তা দর্শনজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাঁর আর্ট আবার ইউক্লিডের সহোদর। প্লোটার proto-types সব চিদাকাশের মন্দার পারিজাত বই আর কিছুই নয়। একটা স্বদেশী উদাহরণও নেওয়া যাক্। শঙ্করের দর্শন যে দেশে বিদেশে এত মান্য পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, তার আর্ট। যে গুণে কালিদাসের কবিতা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেই একই গুণে শঙ্করের

দর্শন, সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে সে গুণের নাম হচ্ছে প্রসাদ গুণ। বলা বাহুল্য স্বচ্ছতা হচ্ছে আর্টের সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল জিনিষই অপরিষ্কার, মানুষ নিজের মন ও নিজের হাত এই দুয়ের সহযোগে যা অপরিষ্কার তা পরিষ্কার করে নেয়—সেই পরিষ্কৃত পদার্থের নামই স্বচ্ছ। কিন্তু চিন্তার ধারা স্বচ্ছ হলেই যে গভীর হতে হবে এমন কোনই কথা নেই। বরং সচরাচর দেখ্‌তে পাই লোকের বিশ্বাস যে, যে-বস্তু যত ঘোলা তা তত গভীর। মানুষে হেগেলের চিন্তাকে যে এত গভীর মনে করে, তার প্রধান কারণ সে চিন্তার ধারা আগাগোড়া কাদাগোলা।

যে মনোভাব থেকে মানুষে রঙকে স্বচ্ছ করে, সেই একই মনোভাব থেকে মানুষে রেখাকে সরল করে। সুতরাং রচনার ভিতর যেখানে স্বচ্ছতা আছে সেখানে ঋজুতার সাক্ষাৎ পাবার আশা করা যায়। শঙ্কর এ বিষয়ে আমাদের নিরাশ করেন না। তাঁর মনও জ্যামিতির ছাঁচে ঢালা। তাঁর চিন্তা একটা সরল রেখা ধরে চলে বলে' তার সঙ্গে সঙ্গে চলা এত সহজ। এ চলার যা আনন্দ সে হচ্ছে পুরোপুরি আর্ট উপভোগ করবার আনন্দ। তাঁর অনুগামী হয়ে আমরা কি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কি অতীন্দ্রিয় কোনরূপ জ্ঞানের পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইনে। প্রথমত তিনি এই বহুরূপী বিশ্বকে মায়া বলে, অর্থাৎ তার রূপ বাদ দিয়ে জিনিসটিকে বেজায় স্বচ্ছ করে নিয়েছেন। তারপর তাঁর যুক্তি একটা সরলরেখা ধরে শেষটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যার স্থিতি আছে অথচ ব্যাপ্তি নেই অর্থাৎ বিন্দুতে। শঙ্করভাষ্যের প্রধান গুণ যে তার আর্ট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে ভাষ্যের সঙ্গে উপনিষদের তুলনা করলে। উপনিষদে যা আছে সে হচ্ছে নিছক poetry, অর্থাৎ তার

সীমারেখাও স্পষ্ট নয় তার বর্ণও স্বচ্ছ নয়। অনন্তের ছায়ায় তা আবছায়া। অসীমের দেশে তার সীমারেখা বিলিন। এক কথায়, উপনিষদ্ ইংরেজিতে যাকে বলে রোমাণ্টিক আর তার ভাষ্য ক্লাসিক। আর এ দুয়ের মূল প্রভেদটা এই যে, ক্লাসিক-সাহিত্য রেখাবদ্ধ আর রোমাণ্টিক-সাহিত্য বর্ণবিদ্ধ, অর্থাৎ ক্লাসিক-সাহিত্য জ্যামিতির অন্তর্ভূত, আর রোমাণ্টিক তার অতিরিক্ত। এই কারণে হৃদয়াবেগ চিরকালই রোমাণ্টিক এবং আর্ট চিরকালই ক্লাসিক। এ দুয়ের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ বিপরীত। Poetry-র উদ্দেশ্য সসীমকে অসীম করা, আর আর্টের উদ্দেশ্য অসীমকে সসীম করা। মানুষে অবশ্য চিরকাল এই দুইকে মেলাতে চেষ্টা করে আস্‌ছে, এবং এই দুয়ের মিলনে যা জন্মলাভ করে—তাই হচ্ছে যথার্থ কাব্য। তবে কোনও কবির তুলিতে রেখা ফোটে ভাল আর কোনও কবির তুলিতে রঙ, কাব্যে কাব্যে এই যা প্রভেদ। এর পর এ কথা নিশ্চিন্তমনে বলা যায় যে, দর্শন বিজ্ঞানের স্থান কবিতা ও আর্টের উপরে নয়, কেননা বিজ্ঞান যে কনিষ্ঠ-আর্ট এবং দর্শন যে বৃদ্ধ-কবিতা—এ সত্য যদি প্রমাণ কর্‌তে না পেরে থাকি ত এতক্ষণ মিছে বকলুম কেন?

কোথা থেকে সুরু করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়লুম? যুদ্ধ থেকে একেবারে কবিত্বে। এ পত্রে আমার লেখা যে সরলরেখায় চলেছে—তা বল্‌তে পারিনে, তবে এর গোড়ার সঙ্গে আগা যে জোর করেও মেলানো যায় না তা নয়। গোড়ায় বলেছি যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আত্মা অর্থে জাতীয় আত্মা বুঝতে হবে। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ হচ্ছে বিকৃত জর্ম্মাণ-রোমাণ্টিক আত্মার সঙ্গে প্রকৃত ল্যাটিন-ক্লাসিক আত্মার

লড়াই। ক্লাসিক ফ্রান্স তার সীমান্ত রেখা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে—রোমাণ্টিক জর্ম্মাণি তার নিজের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে। শুধু দেশের সীমা নয়, জর্ম্মাণী ইতিমধ্যেই নীতির সীমা, লজিকের সীমা, সামাজিকতার সীমা, এক কথায় সভ্যতার সকল সীমা হুঙ্কার ছেড়ে এক লম্ফে অতিক্রম করেছে। জর্ম্মাণীর জাতীয়-আত্মাকে ঠেলেঠুলে এখন যদি তার স্বদেহে অর্থাৎ স্বদেশে পোরা না যায় তাহলে পৃথিবীতে সভ্যতা বলে আর কোনও জিনিস থাকবে না। কেননা সভ্যতা হচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের আর্ট—অতএব তা বাইরের ও ভিতরের নানাবিধ সীমারেখায় আবদ্ধ। সভ্যতা জিনিসটেই ক্লাসিক এবং ইউরোপের ল্যাটিন জাতিই তার যথার্থ উত্তরাধিকারী। আশা করি তারা সে অন্বয়াগত সম্পত্তি বর্ব্বরতার হাত থেকে এ যাত্রা রক্ষা করতে পারবে। ও বস্তু রক্ষা করবার অন্তত প্রাণপণ চেষ্টা করা যে সভ্য-সমাজের কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেবেলায় সংস্কৃত ক্লাসিকে পড়েছি যে হর্ষবর্দ্ধন—"হুনান্ হন্তুং প্রতিচ্যাং দিশিং জগাম"। হর্ষচরিতের ঐ একটি টুকরোই আমার মনে আছে—কেননা সে বয়েসেও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার ঐ অভিযানের জীবন্ত ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছিল এবং আজও তার রঙ জ্বলে যায়নি। বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াটাই সভ্যতার সব চেয়ে সুন্দর দেহভঙ্গি।

জানি, এ সব কথা শুনে লোকে বলবে—"বীরবলের কথা ছেড়ে দাও—ও ত মার্কামারা ফরাসি-ভক্ত।" এ খ্যাতি প্রত্যাখ্যান করতে আমি কিছুমাত্র ব্যগ্র নই। লোকে বলে আমার শরীরে ভক্তির লেশ নেই, অতএব আমার ফরাসি-ভক্তির খ্যাতি, "খোস খবরের ঝুঁটোও

ভাল" হিসেবে গ্রাহ্য। খাঁটি কথা এই যে, ফরাসীদের প্রতি আমার ভক্তি নেই—প্রীতি আছে, তার কারণ ফরাসীরা দেবতা নয় মানুষ। মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়ার চাইতে আর বড় কৃতীত্ব নেই, কেননা তা হওয়া ভারি শক্ত। জর্ম্মাণরা মানুষ না হয়ে অতিমানুষ হতে গিয়েই অমানুষ হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক্, আমার কথা তুমি ভুল বুঝো না। আমি রোমাণ্টিক মনোভাবকে বর্ব্বরতা বলছি নে। ক্লাসিক মন রেখাপাত করে, রোমাণ্টিক মন তার অন্তরে বর্ণ বিন্যাস করে। এর প্রথমটির ভিতর দ্বিতীয়টি অনুপ্রবিষ্ট না হলে, কি সমাজ কি সাহিত্য কিছুই ঐশ্বর্য্য লাভ করে না। তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে, শুধু রেখায় ছবি আঁকা যায়, শুধু রঙে যায় না। অতএব সুস্থ মনের প্রথম কাজ হচ্ছে কাঠাম গড়া ও খাড়া রাখা। সুবুদ্ধি কাঠাম তৈরি করে সুহৃদয় তার ভিতর রঙ ভরে দেয়। কিন্তু যে হৃদয়াবেগ আর্টের হাতে গড়া সুঠাম কাঠাম ভেঙ্গে ফেলতে চায়, সেই হৃদয়াবেগই বর্ব্বর, কেননা তা অন্ধ। আজকের দিনে জর্ম্মাণির জাতীয়-আত্মা রূপান্ধতার এত প্রবল প্রমাণ দিচ্ছে যে, সে আত্মাকে আর্টিষ্টিক অর্থাৎ সভ্য বলা অসম্ভব। রোমাণ্টিক আত্মা বিপথে গেলেই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়—আর ও মনোভাবের উদ্ভ্রান্ত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে। রোমাণ্টিক আত্মার ছোটবার খোলা রাস্তা হচ্ছে, উপরের দিকে—আশে পাশে নয়। তার চোখ আকাশ ছেড়ে মাটির উপর পড়লেই সে স্থলে আগুন জ্বলে। সে যাই হোক্, আমার জ্যামিতিক বন্ধু বলেন যে, ইউক্লিডের জ্ঞান থাকলে জর্ম্মাণরা সমস্ত পৃথিবীকে জর্ম্মাণীর অন্তর্ভূত করবার চেষ্টা করত না, কেননা ও চেষ্টা হচ্ছে একটা বিরাট বৃত্তকে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করবার চেষ্টা।

ঢের বাজে বকেছি, এইখানেই দাঁড়ি টানা যাক, নইলে আমার বাচালতা পত্র ব্যবহারের সকল সীমা লঙ্ঘন করবে। এ লেখায় এত ফাঁক থেকে গেল যে, তোমার বুদ্ধির ছুরি, এর গায়ে যেখানে খুসি অনায়াসে চালাতে পারবে। তবে বুদ্ধির ছুরি না চালিয়ে যদি এ পত্রের গায়ে বুদ্ধির আলো ফেলো—তাহলে হয়ত দেখতে পাবে এর এক আধটা ফাঁক দিয়ে এক আধটা সত্য উঁকিঝুঁকি মারছে।

২৬শে মে ১৯১৮ বীরবল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

[সম্প্রতি Lonis Chadourne নামক জনৈক ফরাসি লেখক, ফরাসি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের Gardener-এর একটি অতি সুন্দর সমালোচনা লিখেছেন। সে প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ জুন মাসের Modern Review-য়ে প্রকাশিত হবে। সমালোচক একস্থলে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের কবিতার ভিতর, despair এবং resignation-এর সুর আদপেই নেই। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে "মানসী" পড়ে, আমি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখি তাতে এই কথা ছিল, যে মানসীর মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর সুর আছে। সে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন—সেখানি আজ প্রকাশ করছি, এই বিশ্বাসে যে এ বিষয়ে কবির নিজের মুখের কথার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয় পত্রে প্রথম পত্রের জের চলে এসেছে বলে, এই সঙ্গে সেখানিও প্রকাশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

ভাই প্রমথ!

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরেছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে

বাঘ বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সবকটা জান্‌লা খুলে দিয়ে, এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড় বড় গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোক চলাচলের প্রতি, অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে, একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন, কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মনসম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignation-এর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে

বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কি ভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো—তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে Objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা—কারণ আমার প্রতি-মুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান, যে, মোটের উপরে আমি যে কি তা দেখ্‌তে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন—কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtseff-এর Journal আমিও পড়ছি—মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে—কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না—অতএব আজ বিদায়।

২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাই প্রমথ !

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে—মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—এবং পৃষ্ঠদেশ যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি—যাকে চক্ষেও দেখিনে—বহু পরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত, যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনা রাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক' লাইন চিঠি লিখলুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশী মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসীসম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারে না, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা কর্‌চি। জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানব-মনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে—তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্চে—কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল পাওয়া যায় না কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশী আজ্ঞা-বহ। তাই জন্যেই সাধ যায় "সত্য যদি হত কল্পনা"—আমি দুটো

যদি এক করতে পারতুম ! অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম ! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই—কেউ বা বল্‌চে, আছে বলে বহির্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্চে—কেউ বা জানে, নেই—তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাস ভাবে কল্পনা পুত্তলী গড়িয়ে তাকে পুজো করচে। একেই বল ভালবাসা ? আমার ভালবাসার লোক কই ? আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে, সে artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিন্ন পত্র।

—ঃ*ঃ—

কর্ম্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দ্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়না ফাঁকা, পায়না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেচে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্ব্বনাশে
হারিয়ে ছিলেম বিশ্বজগৎ খানি।
নীল আকাশের সোণার বাণী
সকাল সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছতনা মোর বাতায়ন দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।

অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কি যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সঙ্গোপনে বহন করে' কর্ম্মরথে
সমারোহে চল্‌তেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিন্‌টে চার্‌টে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়্‌তে হ'ত নকল সিংহনাদ ;
বীড্‌ন্ কুঞ্জে মীটিং হ'লে আমি হতেম বক্তা ;
রিপোর্ট লিখ্‌তে হত তক্তা তক্তা ;
যুদ্ধ হ'ত সেনেট সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিন রাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বল্‌ত, "কর্‌চ কি এ ?
মারা যাবে শেষে"!
আমি বল্‌তেম হেসে,
"কি করি ভাই, খাট্‌তে কি হয় সাধে ?
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কি করি তার উপায় বল্‌তে পারো" ?
বিশ্বকর্ম্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সে দিন তখন দু' তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্ট খানা লিখেচি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মর্‌তে হবে ভোট্ কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্র ভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা সার,
আমার হ'ল তেম্‌নি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিইনে কথা কাণে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া ত থাক্ পরে"।

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হ'ল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখী ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চল্‌চে উঠে নেবে,
নাইক দাঁড়ি কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।

আর হ'ল না পড়া,
মনে হ'ল কোন বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠি খানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
'সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে কি পূবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেচি, চল্‌চি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে
আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার কর্‌লে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজ পত্রে চল্‌ল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়্‌ল হাতে,
সেটা নিয়ে কি কর্‌ব তাই ভাব্‌চি বসে আরাম কেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন পবন ভরে
ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো এসে পড়্‌ল আমার কোলের পরে।
অন্য মনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়্‌ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে" ?
মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ?
অম্‌নি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভরে',
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।

সেই ত আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
সেই ত আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেচে পথহারা;
সেই ত আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে;
সেই ত আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অম্‌নি ওদের বাড়ীর পানে ছোটা।

ওরি সঙ্গে সুরু হ'ত দিনের প্রথম খেলা;
মনে পড়ে, পিঠের পরে চুল্‌টি মেলা
সেই আনন্দ মূর্ত্তি খানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
অসীম ধৈর্য্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মান্‌ত মন্নু হার।
উঠে গাছের আগ্‌ডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি করে,'
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুল্‌তে পারি কি সে?
মনে পড়ে নীরব ব্যাথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার;

ফেলেচে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজ্‌ত কত ছল।
আরো কিছু বড় হ'লে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে'।
নাম্‌তাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠ্‌ত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরাজি বই দেখে'
ভাব্‌ত মনে গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাৎ সোজা।

হেন কালে হঠাৎ সে-বার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধ্‌ল মকর্দ্দমা,
কেউ কাহারে কর্‌লে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জ্জন,
মোর প্রতিমার হল' বিসর্জ্জন।

দেখা শোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুন্‌তে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠ্‌ল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যা-তারার মত;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বল্‌ল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।
কত বছর গেল চলে'
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হ'লে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ী কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল,
হ'ল অনেক কাল।
বিয়ে করে মন্নুর স্বামী
কোন দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।

সেই মন্নু আজ এত কালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্য সখার কাছে
হৃদয় ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে?
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি?

মন্নুরে কি গেছ ভুলে?
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটী ফোঁটা চোখের জলের মত!
কত চিঠির জবাব লিখ্‌ব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বল্‌বে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।